বাংলাদেশ ও আন্ড়র্জাতিক সম্পর্ক
Bangladesh and International Relations

ইউনিট-৯

ভূমিকা :

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একটি নতুন রাষ্ট্র হলেও জনসংখ্যা ও অবস্থানগত কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্ব-ব্যবস্থায় বাংলাদেশ যেমন অন্য দেশকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে, তেমনি অন্য দেশের কাছ থেকে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েও থাকে। আধুনিক কালে পরস্পরের মধ্যে দেয়া- নেয়ার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে আন্ড়রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি এদিক দিয়ে তাই সফল। বাংলাদেশ সবার সাথে বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে, কারো সাথে বিবাদে জড়াতে চায় না। এ জন্যই বাংলাদেশ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা বাংলাদেশের অভিপ্রায়। এ লক্ষ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে বাংলাদেশ 'সার্ক' গঠনে উদ্যোগী হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে সাফল্যও অর্জন করেছে। শুধু প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনই নয়, বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়ও মনোযোগী। ধর্ম ও ঐতিহ্যগত বন্ধনকে জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ ও. আই. সি.'র সদস্য হয়ে এ সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনুন্নত ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও বিশ্ব-রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণে বিশ্ব-সভায় বাংলাদেশ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

'বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শীর্ষক ইউনিটের বিষয়কে আমরা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব :

- *পাঠ - ১ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।*
- *পাঠ - ২ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের উপাদান।*
- *পাঠ - ৩ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন।*
- *পাঠ - ৪ সার্ক।*
- *পাঠ - ৫ ও. আই. সি.।*

পাঠ - ১

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

Aims and Objectives of Bangladesh Foreign Policy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- পররাষ্ট্র নীতির সংজ্ঞা নিরুপণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পররাষ্ট্র নীতির সংজ্ঞা

বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশকেই অন্যান্য দেশের সাথে কোন না কোন সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। বর্তমান যুগে অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক না রেখে কোন রাষ্ট্রই টিকে থাকতে ও উন্নতি করতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যবস্থায় নিজ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের জাতীয় নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। পররাষ্ট্রনীতি মূলত: একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্ড়বায়নের একটি বিশেষ পদ্ধতি বা মাধ্যম। অর্থাৎ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কোন নীতির ভিত্তিতে স্থাপিত হবে এবং পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকর হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গীই পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে প্রতিফলিত হয়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, নির্দিষ্ট আন্ত:রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুসরণের জন্য গৃহীত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তই হল পররাষ্ট্র নীতি। পররাষ্ট্র নীতিকে সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। সংকীর্ণ অর্থে পররাষ্ট্র নীতি হলো, অন্য কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামরিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের নীতিমালা। আর ব্যাপক অর্থে পররাষ্ট্র নীতি বলতে বিশ্ব-ব্যবস্থা ও তার পরিবেশ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা এবং ক্রিয়াকলাপকে বুঝায়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। সে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনেরও সদস্য। সুতরাং সে স্বভাবতই সম্মিলিত জাতিসংঘের সনদ (Charter) ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতিসমূহ মেনে চলে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান মূলনীতিটি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলছেন যে, ''আমাদের দেশটি ক্ষুদ্র তাই কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, আমরা চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব।'' তাঁর এই উক্তির মধ্যেই আমাদের পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান দিকগুলো হল :

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল- সবার প্রতি বন্ধুত্ব, অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং বিশ্ব শান্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ।

১.সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয় : যেহেতু বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে কোন একটির পক্ষাবলম্বন করে অন্যটির বিরাগভাজন হতে চায় না। এর চেয়েও বড় কথা হল যে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অপ্রকাশের পর বাংলাদেশ চায় না যে, সে কোন বৃহৎ শক্তির খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

২. অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা: এ মূলনীতিটি জাতিসংঘ সনদের ২(৪) ধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা : এ মূলনীতিটিও জাতিসংঘ সনদের ২(৭) ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে ২ ও ৩ নম্বর মুলনীতি দুটি রাষ্ট্রীয় আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আদর্শের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. **বিশ্ব শান্ড়ি :** বাংলাদেশ যে শান্ড়ি কামনা করে, তা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই ব্যক্ত করেছিলেন। তখন তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে দেখতে চাই।' এ ব্যাপারে বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যথার্থই বলেছেন যে, 'বাংলাদেশ শুধু শান্ড়ির উদ্দেশ্যেই শান্ড়ি চায় না, এর আরও কারণ হল তার জাতীয় উন্নতি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সুপরিকল্পিত বিবেচনা।' বাংলাদেশ কর্তৃক অন্বেষিত শান্তির এই মূলনীতির কয়েকটি তাৎপর্য নিম্নরূপ :

- প্রথমত: বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে;
- দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ যে কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পক্ষপাতি; এবং
- তৃতীয়ত: বাংলাদেশ চায় যে, যে কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও সবসময় মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ কখনও বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপওার প্রতি হুমকি প্রদর্শন না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আত্মরক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জাতীয় শক্তি রক্ষা ও প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা, নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা ও জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আগেই বলা হয়েছে, যে কোন দেশ বহির্বিশ্বের কাছ থেকে তার উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য তার পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশও এই প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিয়মের বাইরে নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলিকে আমরা বর্ণনা করতে পারি :

১. আত্মরক্ষা,

২. অর্থনৈতিক অগ্রগতি,

৩. অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের জাতীয় শক্তিকে রক্ষা ও প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা,

৪. নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা, ও

৫. জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

আত্মরক্ষা : অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের বেলায়ও এ কথা সত্যি যে, আত্মরক্ষা হল আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ। কোন রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা বলতে সাধারণতঃ বোঝায় তার সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতা বজায় রাখা। জাতীয় নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টি এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। বস্তুতঃপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখন্ডতার সম্মিলিত প্রতিফলন মাত্র। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পরও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি বহুবার বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি এসেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা বাস্তবিকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হবে আমাদের জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো সংরক্ষণ করা এবং সময় ও সুযোগমত এগুলোকে বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি : যদি আমরা আমাদের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হই, তবে তার পরেই আসবে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নটি। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি গরিব রাষ্ট্র, কিন্তু তবু এর মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা যদি আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরা উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারেন, তবে তা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সক্ষম হবে। বর্তমানে আমাদের যা দরকার তা হল সহজ শর্তে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং তা যথার্থ উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়ে আমাদের উৎপাদন বাড়ানো এবং এ ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা। একই সাথে এ দিকের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে উপযুক্ত বাজার পায়।

জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি : বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হল আমাদের জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। জাতীয় শক্তি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে আমাদের দেশের সার্বিক ক্ষমতা, যা আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান

রাখতে পারে। জাতীয় শক্তি হল অনেকগুলো উপাদানের যোগফল। ঐগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সে উল্লিখিত সম্পদরাজির উপর তার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। সেই সাথে তার সমুদ্রের তলদেশ ও অভ্যন্তরীণ জলসীমার মধ্যে অবস্থিত সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদের উপর যে কোন রকম বৈদেশিক দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। এভাবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি প্রণেতাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হবে আমাদের জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোকে সংরক্ষণ এবং সময় ও সুযোগ বুঝে এগুলোকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো।

নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা : বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রই কোন না কোন মতবাদ অনুসরণ করে থাকে অথবা কমপক্ষে প্রচলিত যে কোন মতবাদের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ব্যাপারে বলা যায় যে, সে ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক এ - দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের কোনটিই পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে না। বরং দু'টি পদ্ধতির ভাল দিকগুলো নিয়ে একটি মিশ্র অর্থনীতিকে অনুসরণ করে থাকে।

জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি : একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর তাকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রধানতঃ এ কারণে যে, তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। নয় মাসের যুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংস ক্ষয়ক্ষতি এবং উৎপাদনের কর্মকান্ড স্থগিত থাকার কারণে আমরা স্বাধীনতার পর গভীরভাবে অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হই। কিন্তু এটা চিরদিনের জন্য চলতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশ যাতে তার মর্যাদা বজায় রেখে বহির্বিশ্বে একটি মর্যাদাকর ভাবমূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো আমাদের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

সারকথা: *পররাষ্ট্রনীতি একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের একটি বিশেষ পদ্ধতি বা মাধ্যম। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে যে দৃষ্টিভঙ্গী বা লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে তা মূলত: জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সবার সাথে বন্ধুত্ব, সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পররাষ্ট্রনীতিতে যে সব লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো-আত্মরক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা, নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা এবং জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন্ দেশসমূহের সহায়তা অধিক প্রত্যাশা করে?

ক) ধনী ও শিল্পোন্নত দেশসমূহ এবং ইসলামী বিশ্ব;
খ) ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশসমূহ;
গ) রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চল;
ঘ) সাব-সাহারা আফ্রিকা।

২। বাংলাদেশ কোন্ রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক অসমতা কমিয়ে আনতে সচেষ্ট?

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র;
খ) ভারত;
গ) আর্জেন্টিনা;
ঘ) মায়ানমার।

৩। অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের কত নম্বর ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক) ১ (২);
খ) ২ (৩);
গ) ৩ (৪);
ঘ) ২ (৭)।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :

১। পররাষ্ট্র নীতির উপাদানসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কি ভাবে নির্ধারিত হয়?
২। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৩। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ ১. ক, ২. খ, ৩. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *J. J. Frankel, The Making of Foreign Policy*
২। *J .H Politics Among Nations ,Morgenthau .*

পাঠ-২

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের উপাদান
Elements of Bangladesh Foreign Policy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- পররাষ্ট্র নীতির সাধারণ উপাদান কি কি তা বলতে পারবেন।
- পররাষ্ট্র নীতির উপাদানসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পররাষ্ট্র নীতির সাধারণ উপাদান

পররাষ্ট্র নীতি এককভাবে নীতি প্রণেতাদের ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর নির্ভরশীল নয়। পররাষ্ট্র নীতি প্রণেতাগণকে বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যে সব উপাদানের উপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্র নীতি প্রণীত হয়, সে সব উপাদানকে পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক হিসেবেও অভিহিত করা যায়। পররাষ্ট্র নীতির সাধারণ উপাদানসমূহ হল-

- ভৌগোলিক-কৌশলগত অবস্থান;
- জনসংখ্যা;
- অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর;
- মতাদর্শগত পরিবেশ;
- সামরিক সামর্থ্য;
- প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ।

পররাষ্ট্র নীতির উপাদানসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব

সময় ও পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে পররাষ্ট্র নীতির আপেক্ষিক গুরুত্ব কমেও বেড়ে যেতে পারে।

পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক উপাদান অনেক। এর মধ্যে কোন কোন উপাদান দৃশ্যমান (visible) এবং কোন কোনটি অদৃশ্যমান (invisible)। যেমন, ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামরিক সামর্থ্য ইত্যাদি উপাদানগুলো সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু মতাদর্শগত পরিবেশ, প্রতিবেশীদের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ—এ উপাদানগুলো দৃশ্যমান নয়। দৃশ্যমানই হোক আর অদৃশ্যমানই হোক প্রতিটি উপাদানই পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এসব উপাদানের মধ্যে কোনটি মূখ্য এবং কোনটি গৌণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ ছাড়া, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পররাষ্ট্র নীতির কোন কোন উপাদানের গুরুত্ব কমে যেতে পারে, আবার কোন কোন উপাদানের গুরুত্ব বেড়েও যেতে পারে। যেমন, দূর পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র এবং উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পর ভূ-কৌশলগত উপাদানের গুরুত্ব কমে গেছে, বেড়ে গেছে সামরিক সামর্থ্যের গুরুত্ব। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব নিরসন তথা স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর মতাদর্শের গুরুত্ব কমে গেছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির গুরুত্ব বেড়ে গেছে । পররাষ্ট্র নীতির উপাদানগুলোর গুরুত্ব আপেক্ষিক অর্থে বেড়ে বা কমে যেতে পারে, কিন্তু কোন উপাদানই কখনও গুরুত্বহীন হয়ে যায় না। একারণে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সব উপাদানকেই বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা থাকে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির বিভিন্ন উপাদান

পররাষ্ট্র নীতির উল্লেখিত উপাদানসমূহের আলোকে এখন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

ভৌগোলিক-কৌশলগত অবস্থান : ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমারের সাথে সংকীর্ণ সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশের তিন দিক ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত বলে এবং

প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলো ভারতের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত হবার কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে ভারতকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে উঠে। বাংলাদেশের উপকূল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কারণে কৌশলগত বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এই সুযোগকে কাজ লাগিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের অনুকূল পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করেছে, যার ফলশ্রুতিই হল 'বিমসটেক'। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-ভাগ সন্নিহিত বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত বলে বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরকে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত রাখতে সচেষ্ট। কৌশলগত বিবেচনায় বাংলাদেশের নিরাপত্তা যেহেতু ভারত মহাসাগরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সাথে যুক্ত, সে কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি সে লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে।

জনসংখ্যা : বাংলাদেশের জনসংখ্যা চীন ও ভারতের মতো অধিকও নয়, আবার ভূটান ও মালদ্বীপের মতো কমও নয়। বাংলাদেশ জনসংখ্যাগত বিবেচনায় বিশ্বের মধ্যম পর্যায়ের একটি দেশ। এ দেশের বারো কোটি জনসংখ্যা প্রধানত:ই সমজাতীয়। এ সমজাতীয় জনসংখ্যা বাংলাদেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং বিশ্বে গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের মতো বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভীতি ও অস্ড়িত্ব সংকট তীব্র হয়ে উঠেনি। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি কারো প্রতি নতজানু নয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কারো উপর নির্ভরশীল নয়। এ ছাড়া, বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ জনশক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশও শ্রমশক্তির জন্য বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। এ কারণে উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের দরকষাকষির ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে জনসংখ্যার গুরুত্ব তাই এতো বেশী।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ জনশক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে প্রবেশ করায় অনেক উন্নত দেশও শ্রমশক্তির জন্য বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর : অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনুন্নত। একদিকে এদেশে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, অন্যদিকে কৃষিতে সনাতন প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন সংকট বিদ্যমান। এমনকি ভূ-অভ্যন্তরে যে সব প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ আছে তা উত্তোলনের ক্ষমতাও বাংলাদেশের নেই। মূলত: পুঁজি গঠনের নিম্ন হার ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবজনিত কারণেই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে গতিশীল করা যাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশকে পুঁজি ও প্রযুক্তির জন্য উন্নত দেশসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্র নীতিকে এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে উন্নত বিশ্বের সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঋণ, সাহায্য এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর যদি উন্নত হতো তাহলে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক সাহায্য আদায়ের পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতো না।

মতাদর্শগত পরিবেশ : মতাদর্শগত পরিবেশ অনেক সময়েই পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। পঁচাত্তর-পূর্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের প্রভাবে বাংলাদেশ ছিল ভারত ও সোভিয়েত ঘেষা। পরবর্তীকালে উদার ও ইসলামী মতাদর্শ অনুসরণের ফলে দেশের সম্পর্ক বেড়েছে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে। সাম্প্রতিককালে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের চরম বিপর্যয় এবং উদার গণতান্ত্রিক মতাদর্শের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে পাশ্চাত্যমুখী ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছে।

সামরিক সামর্থ্য : বাংলাদেশের চেয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সামরিক ক্ষমতা বহু গুণ বেশী। সেজন্যে বাংলাদেশের মধ্যে সব সময়েই নিরাপত্তা ভীতি বিরাজ করে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে ভারতের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলার এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু জল, স্থল ও আকাশে নিজের আত্মরক্ষার জন্যই উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র নীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ : বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবে বিশেষভাবে ভারতের এবং সাধারণভাবে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশ ও মায়ানমারের আচরণের উপর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি নির্ভর করে। সীমান্ত সংশ্লিষ্ট বৈরীতা, জনসংখ্যা স্থানান্তর, সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ, বাণিজ্য ব্যবধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রতিবেশীদের আচরণের উপর দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। প্রতিবেশীদের আচরণ সংযত ও বন্ধুত্বপূর্ণ হলে বাংলাদেশও সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়ে উঠে। তা না হলে জাতিসংঘ ও বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার নীতি গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক পরিবেশ, বিশেষ করে পারমাণবিক উত্তেজনা বাংলাদেশকে বিচলিত করে। তাই বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে পারমানবিক প্রতিযোগিতামুক্ত বিশ্ব-পরিবেশ গড়ে তোলার ইচ্ছা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে প্রতিফলিত হয়।

এতোক্ষণ আমরা যেসব উপাদান নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলোই পররাষ্ট্র নীতির মূখ্য উপাদান। মূলত এসব উপাদানের ভিত্তিতেই কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারিত হয়।

সারকথা: *পররাষ্ট্রনীতির অনেকগুলো উপাদান থাকে। এর মধ্যে কোন কোন উপাদান দৃশ্যমান এবং কোন কোনটি অদৃশ্যমান। দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যমান উভয় ক্ষেত্রেই কোন কোন উপাদান সময় ও পরিবেশের কারণে মূখ্য কিংবা গৌন হিসেবে বিবে হতে পারে। বাংলাদেশর পররাষ্ট্র নীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হল: কৌশলগত অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর, মতাদর্শগত পরিবেশ, সামরিক সামর্থ্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। পররাষ্ট্র নীতির অদৃশ্যমান উপাদান কোন্‌টি ?

ক) অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর;
খ) জনসংখ্যা;
গ) মতাদর্শগত পরিবেশ;
ঘ) সামরিক সামর্থ্য।

২। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোন্‌টি?

ক) নেপাল;
খ) মায়ানমার;
গ) শ্রীলঙ্কা;
ঘ) পাকিস্ড়ান।

৩। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর মতাদর্শের গুরুত্ব কমে গিয়ে কোন উপাদানের গুরুত্ব বেড়েছে?

ক) অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর;
খ) জনসংখ্যা;
গ) ভৌগলিক ও কৌশলগত অবস্থান;
ঘ) সামরিক সামর্থ্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংকীর্ণ অর্থে পররাষ্ট্র নীতি বলতে আপনি কি বুঝেন?

২। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ক।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *J. J. Frankel, The Making of Foreign Policy.*
২। *Emajuddin Ahmed (ed.), Foreign Policy of Bangladesh : A Small States Imperatives.*

পাঠ - ৩

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন
Non Alignment Movement

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করতে পারবেন।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম ও বিকাশধারা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

জোটনিরক্ষেতা হল এমন একটি নীতি যার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক কোন জোটেই প্রবেশ না করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

'জোট নিরপেক্ষতা' বলতে কি বুঝায়, তা নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনেকে জোট নিরপেক্ষতাকে 'নিরপেক্ষতা' ও 'নিরপেক্ষতা নীতিবাদের' (Neutralism) সমার্থক ধারণারূপে ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপক বার্টনের মতে, জোট নিরপেক্ষতা হল এমন এক নীতি যার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক কোন জোটেই যোগদান করে না। অর্থাৎ তৎকালীন সোভিয়েত বা মার্কিন কোন জোটে যোগদান না করে উভয় জোটের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হচ্ছে জোট নিরপেক্ষতা। জোট নিরপেক্ষতা বলতে কঠোর নিরপেক্ষতা বুঝায় না বরং গতিশীল নিরপেক্ষতা (Dynamic neutrality) বুঝায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর নিজস্ব মতামত থাকে এবং কোন সামরিক জোটে যোগ না দিয়ে নিজেদের উদ্যোগে ঐসব বিরোধ মীমাংসা চেষ্টা করে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সংজ্ঞা নিরূপণ করার পর আমরা কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবো। যেমন-

১. কোন সামরিক জোটভুক্ত দেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হতে পারে না।
২. সামরিক জোটভুক্ত নয় এমন যে কোন দেশ স্বেচ্ছায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হতে পারে এবং যে কোন সময় জোট ত্যাগ করতে পারে।
৩. জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে কোন পক্ষকে সমর্থন দিতে পারে না।
৪. সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম দিক।
৫. জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক মর্যাদায় বিশ্বাসী।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম ও বিকাশ ধারা

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে।

এখন আমরা কোন প্রেক্ষাপটে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এবং কিভাবে এ আন্দোলন বিকশিত হল তা আলোচনা করব। আমরা জানি, সময়ের এক কঠিন প্রেক্ষাপটে জন্ম হয়েছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত নতুন দেশগুলো উন্নয়নের জন্য স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যৌথ আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে তীব্রভাবে। এ প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের শক্তিহীন, শান্তিপ্রিয় ও উন্নয়নকামী দেশগুলোকে একটি জোটে এনে পরাশক্তির প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন, যুগোপাভিয়ার মার্শাল টিটো এবং ভারতের নেহেরু। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। নির্জোট আন্দোলনের প্রথম বৈঠক বসে ১৯৬১ সালের ১ সেপ্টেম্বর। সাবেক যুগোশ-াভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ২৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনের আলোচ্যসূচীর মধ্যে ছিল: (১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর মতবিনিময় (২) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার (৩) উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (৪) রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা (৫) বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদ উচ্ছেদ (৬) সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ, (৭) জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন, (৮) অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা সমাধান এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মিসরের কায়রোতে ১৯৬৪ সালে। তৃতীয় নির্জোট সম্মেলন ১৯৭০ সালে ৮ সেপ্টেম্বর হতে ১০ সেপ্টেম্বর জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ সম্মেলন আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে সমাপ্ত হয় ১৯৭৩ সালে। পঞ্চম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯ আগস্ট শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে শেষ হয়। ১৯৭৯ সালে কিউবার হাভানায় নির্জোট দেশসমূহের ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৭ম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন ১৯৮৬ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের ৩১ আগস্ট হতে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারেতে অনুষ্ঠিত হয় ৮ম নির্জোট শীর্ষ সম্মেলন। নবম শীর্ষ সম্মেলন যুগোশ-ভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। দশম নির্জোট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯২ সালে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ড় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। একাদশ শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৫ সালে কলোম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সম্মেলনের মধ্য দিয়েই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিকশিত হয়েছে এবং এ আন্দোলনের বক্তব্য ও কর্মসূচী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ফলাফল

জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো বাস্তব ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষ করি।

প্রথমত : উপনিবেশবাদ অবসানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। ফলে এশিয়া ও আফ্রিকা ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত: সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণকে রাজনীতির দিক থেকে সচেতন করে তুলেছে। কিউবা জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর অংশীদার হওয়ায় ল্যাতিন আমেরিকা সচেতন হচ্ছে। যদিও মার্কিন জোর প্রভাব তারা ছিন্ন করতে পারে নাই তবুও বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন মতাদর্শগত পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি ঠিকই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়েছে।

তৃতীয়ত : বিশ্ব রাজনীতি এখন দুই মহাশক্তির নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে না। আফ্রিকা ও এশিয়ার ছোট দেশগুলো বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। একাধিক রাষ্ট্রের যৌথ কণ্ঠস্বর কোন বৃহৎ শক্তি অগ্রাহ্য করতে পারছে না। ছোট ছোট রাষ্ট্র যে আজ বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আসতে পেরেছে তার জন্য কৃতিত্ব জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাপ্য।

চতুর্থত : অস্ত্রোৎপাদন, সামরিক মোর্চা গঠন অথবা বিদেশে সামরিক ঘাটি তৈরি যে শান্তি ও নিরাপত্তার সহায়ক নয় এ কথা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বিশ্ববাসীকে বুঝিয়েছে।

পঞ্চমত : জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো মতাদর্শগত পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। সমাজবাদ, রক্ষণশীলতা ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পাশাপাশি তারা অবস্থান করছে।

ষষ্ঠত : উন্নত দেশ কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যেটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা পাচ্ছে তার জন্য জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনই কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান

জোট নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, জন্ম ও বিকাশধারা এবং অবদান আলোচনার পর আমরা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করব। আমরা জানি, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আলজিয়ার্স সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। এরপর থেকে প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগদান করেছে এবং জোড়ালো ভূমিকা রেখেছে। এ কারণেই বাংলাদেশ অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ফোরাম 'জি-৭৭' - এর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে বলেই বহু রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক

ঘটনাবলীর উপর বাংলাদেশের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের আদর্শের ভিত্তিতে তার পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করেছে- যার মধ্যে শান্তি, সমতা ও বন্ধুত্বের আকা ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। জোট নিরপেক্ষতার চেতনার আলোকে বাংলাদেশ নামিবিয়ার স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের বিরোধিতা করেছিল। এছাড়া, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী ও কুয়েত থেকে ইরাকী বাহিনী প্রত্যাহারেরও জোর দাবী জানিয়েছিল। বর্তমানে ফিলিস্ড়িনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে। এ সব কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ-দক্ষিণ পুর্ব সহযোগিতা অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি কার্যকর ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণেই, বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

সারকথাঃ *দুই পরাশক্তির মধ্যেকার স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিতে জোটনিরপেক্ষকতার ধারণা গড়ে উঠেছিল। জোট নিরপেক্ষতা হল এমন এক নীতি যার মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র ধণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কোন জোটেই যোগদান করে না। অর্থাৎ ন্যাটো বা ওয়ারস জোটে যোগদান না করে উভয় জোটের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হচ্ছে জোট নিরপেক্ষতা। ১৯৫৫ সাথে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলন থেকে এ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ বিরোধিতা এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক। কিন্তু বর্তমানে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর এ আন্দোলনের গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। তবে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এখনও গুরুত্ব বহন করে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। জোট নিরপেক্ষতা বলতে প্রকৃত অর্থে কি বুঝায়?

ক) কঠোর নিরপেক্ষতা;
খ) 'ন্যাটো জোট' বিরোধিতা;
গ) গতিশীল নিরপেক্ষতা;
ঘ) কম্যুনিস্ট বিরোধী অবস্থান।

২। কোন্ সময়ের প্রেক্ষাপটে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল?

ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে;
খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে;
গ) ফরাসী বিপ- বোত্তর প্রেক্ষাপটে;
ঘ) ায়ুযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে।

২। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?

ক) ১৯৫৩;
খ) ১৯৫১;
গ) ১৯৬১;
ঘ) ১৯৫৫।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জোট নিরপেক্ষতা বলতে কি বুঝেন?

২। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আন্ড়র্জাতিক প্রেক্ষাপটে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *Burton, International Relations.*
২। *Shamsul Haq(ed.) Bangladesh in International Politics : The Dilemmas of the Weak States.*

পাঠ - ৪

সার্ক
SAARC

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- সার্কের জন্ম ও এর বিকাশ ধারা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য ও এর নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।
- 'সাপটা' সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সার্কের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সার্কের জন্ম ও বিকাশধারা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্নে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর কাছে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্ড়াব পেশ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে সার্ক গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। পররাষ্ট্র সচিবদের আরও তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কাঠমুন্ডু, ইসলামাবাদ ও ঢাকায়। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার অভিযানে এগুলো এক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কলম্বো বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিবগণ একমত হন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা কল্যাণকর, আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রয়োজনীয়। কলম্বো বৈঠক সহযোগিতার পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ষ্টাডি গ্রুপ গঠন করে সমন্বয়কারী দেশে নিয়োগ করা হয় : ১। কৃষি (বাংলাদেশ) ২। পল্লী উন্নয়ন (শ্রীলঙ্কা) ৩। আবহাওয়া (ভারত) ৪। টেলিযোগাযোগ (পাকিস্তান) ৫। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম (নেপাল)। এগুলোই ছিল প্রস্তাবিত পাঁচটি ক্ষেত্র।

কাঠমুন্ডু বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিবগণ সম্ভাব্য সহযোগিতার তিনটি নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন : ১। পরিবহণ ২। ডাক সার্ভিস ৩। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র সচিবদের তৃতীয় বৈঠকে ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে গঠিত হয় আর একটি স্টাডি গ্রুপ। একটি সমন্বিত কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য আবার একটি সর্বময় কমিটি গঠন করা হয়। সর্বময় কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম ঢাকায় পররাষ্ট্র সচিবদের চতুর্থ বৈঠকে গ্রহণ করা হয়। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের প্রথম বৈঠকে সহযোগিতার ক্রমধারা বাস্ড়বায়ন পর্যায়ে এগিয়ে যায়। এ বৈঠকে সমন্বিত কার্যক্রম চালু করবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা গৃহীত হয়।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানগণ নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার ও আন্ড়র্জাতিক ফোরামে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যা 'ঢাকা ঘোষণা' হিসেবে পরিচিত।

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে নয়াদিল্লীতে স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সময় হতে এ পর্যায় শুরু হয় এবং নয়াদিল্লী, মালে ও থিম্পুতে এই কমিটির পরবর্তী চারটি বৈঠক পর্যন্ত তা চলতে থাকে। আঞ্চলিক স্তরে বছরে একবার পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে অবিলম্বে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের বৈঠকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রথম সার্ক সম্মেলনের স্থান হিসেবে ঢাকাকে নির্বাচন করা হয়। ৭ ও ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC : South Asian Association for Regional Co-operation) আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। সম্মেলনে সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ যোগদান করেন এবং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট-এর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপ্রধানগণ নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যা ঐতিহাসিক 'ঢাকা ঘোষণা' নামে পরিচিত। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সার্কের ১ম শীর্ষ সম্মেলন হতে শুরু করে এ পর্যন্ত ১০টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে পালাক্রমে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৯৮ সালে এ যাবৎকালের শেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে।

সার্কের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

এ পর্যায়ে আমরা সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য এবং সার্ক সনদে উল্লেখিত নীতিমালা সর্ম্পকে আলোচনা করব।

প্রথমেই আমরা দেখব সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য কি কি?

সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য হল : ১। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনের মান উন্নত করা ২। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা ৩। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা ৪। একে অন্যের সমস্যায় পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও সহযোগিতার হস্ত প্রসার করা ৫। আর্থ-সামাজিক,সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং ৬। আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিন্ন স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা।

সার্কের নীতিমালায় প্রথমেই সার্বভৌম সমতা, আঞ্চলিক অখন্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

সনদে প্রতি বছর একবার সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। সদস্য দেশগুলো প্রয়োজন মনে করলে একাধিকবার বৈঠকে বসতে পারবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রি পরিষদ বছরে দু'বার বৈঠকে বসবে। বিশেষ বৈঠক সদস্য দেশগুলোর সম্মতিতে হতে পারবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ সংস্থার নীতি প্রণয়ন , অগ্রগতি পর্যালোচনা, সহযোগিতার নয়া ক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ড় নিতে পারবে। পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী বৈঠকে বসবে। সার্বিক সমন্বয়, প্রকল্প ও কর্মসূচি অনুমোদন, আঞ্চলিক ও বহি:সম্পদ যোগানোর দায়িত্ব ছাড়াও এই কমিটি মন্ত্রি পরিষদের কাছে সময়ে সময়ে প্রতিবেদন পেশ এবং নীতি ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিমত চাইবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্যে টেকনিকাল কমিটি থাকবে। সনদে সংস্থার একটি সচিবালয় থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্থার কর্মতৎপরতা পরিচলনার জন্য সদস্য দেশগুলোর চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক হবে না। অঞ্চলের মধ্যে পর্যাপ্ত তহবিল গঠন করা না গেলে সংস্থা বাইরের উপযুক্ত সূত্র হতে আর্থিক সহযোগিতা নিতে পারবে। সংস্থার প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত হতে হবে সর্বসম্মতিক্রমে।

সার্বভৌম সমতা, আঞ্চলিক অখন্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যের অভ্যন্ড়রীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতার- এইসব মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই সার্ক গঠিত হয়েছে।

সাপটা

সার্কের উদ্দেশ্য এবং নীতিমালা আলোচনার পর আমরা সার্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক 'সাপটা' নিয়ে আলোচনা করব। সাপটা (SAPTA)-এর পূর্ণ অর্থ হল: দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা (South Asian Preferential Trade Arrangement)।

সার্কভুক্ত দেশগুলো ১৯৯৩ সালের ১১ই এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৭ম শীর্ষ সম্মেলনের সময় সাপটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বর্তমানে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বাস্তবতাকে সামনে রেখে অত্র এলাকার আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেই স্বাক্ষরিত হয়েছে সাপটা চুক্তি। ১৯৯৭ সাল হতে এ সমঝোতা চুক্তিট কার্যকরী হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়িত হলে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বা সীমানাগত কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। অনেকের মতে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সাপটার মত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। তবে সাপটা চুক্তিতে বেশ নমনীয় শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যার ফলে সার্ক দেশগুলো সহজেই তা কার্যকর করতে পারে। শর্তানুযায়ী কোন দেশ তার অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে সে ব্যবস্থা হতে বেরিয়ে আসার স্বাধীনতা রাখে। স্বাভাবিকভাবেই ভারত বড় দেশ হবার কারণে সাপটার সিংহ ভাগ সুবিধা সে ভোগ করবে। কেননা, ভারতের সাথে অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে যা ভারসাম্যপূর্ণ না হলে সে সব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে সাপটা চুক্তিতে স্বল্প-উন্নত দেশগুলোকে বিশেষ ও অধিক আনুকূল্যের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

সাপটা (SAPTA) কে সাফটায় (SAFTA) রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়া কার্যকর হলে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে আশা করা যায়।

সাপটাকে ২০০১ সালে সাফটায় (South Asian Free Trade Agreement-SAFTA) রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলছে। সাফটা কার্যকর হলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্ত:রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে।

সার্কের সাফল্য ও ব্যর্থতা

আমরা লক্ষ্য করছি, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সার্ক তেরটি বছর অতিক্রম করলো। এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে চূড়ান্ড় মন্তব্য করার সময় এখনও হয় নি। সার্ক গঠনে সাফল্য যে তেমন কিছুই আসেনি তা নয়, তবে প্রত্যাশার চেয়ে তা নিতান্তই কম। ইতোমধ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতার ১৫ টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন - ১. শিক্ষা; ২. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম;

৩. কৃষি ও বনজ সম্পদ; ৪. আবহাওয়া; ৫. ডাক যোগাযোগ; ৬. পল্লী উন্নয়ন; ৭. মাদক দ্রব্যের চোরাচালান ও এর অপব্যবহার প্রতিরোধ; ৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; ৯. ক্রীড়া; ১০. শিল্প ও সংস্কৃতি; ১১. টেলিযোগাযোগ; ১২. পর্যটন; ১৩. পরিবহণ; ১৪. উন্নয়নে নারী সমাজ এবং ১৫. সাপটার আওতায় বাণিজ্য উদারকরণ। সহযোগিতার এসব ক্ষেত্র চিহ্নিত করার পর এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে।

শুধু বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সরকার প্রধানদের এক টেবিলে বসার পরিবেশও সার্কের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে নি:সন্দেহে এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। এর ফলে অবিশ্বাসের মাত্রা এবং পরস্পরের মুখ না দেখার প্রবণতা কিছুটা হলেও কমেছে। এস.ডি. মুনির মতে, 'এ ক্ষেত্রে সার্কের সাফল্য হচ্ছে আস্থা ও বোঝাপড়া সৃষ্টি যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে।'

এ ছাড়া, সার্কের আওতায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর সেমিনার - সিম্পোজিয়াম হচ্ছে। এ সব একাডেমিক কার্যক্রমের ফলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা সহজে অনুধাবন করা যাচ্ছে। সার্ক না হলে হয়তো তা সম্ভব হতো না। সার্কের সাফল্যের আরো দু'টি দিক হচ্ছে সার্ক ফেলোশীপ নিয়ে এখন অনেকেই গবেষণা করতে পারছেন। সার্কের ভিসা অব্যাহতির আওতায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, এম. পি. এবং ভাইস চান্সেলরগণ এ এলাকায় বিনা ভিসায় ভ্রমণ করতে পারছেন। সম্পর্ক উন্নয়নের প্রশ্নে এ দিকগুলোও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু একথা ঠিক, সাফল্যের চেয়ে সার্কের ব্যর্থতার দিকগুলোই বেশী স্পষ্ট। সার্ক ইসি বা আসিয়ান (ASEAN)-র মতো সহযোগিতা সম্প্রসারণ করতে পারে নাই। পারস্পরিক আস্থা অর্জন ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সার্ক এদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। সমালোচকদের দৃষ্টিতে, দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সার্ককে নিবৃত্ত করে রাখাতে সার্ক সম্মেলন সাত দেশের সরকার প্রধানদের পিকনিক পার্টিতে পরিণত হয়েছে। কেননা, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে এখানকার বিবাদগুলো মূলত: দ্বিপাক্ষিক চরিত্রের। কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি; ভারতের সাথে বাংলাদেশের তালপট্টি, শান্ড়ি বাহিনী, ফারাক্কা, কাটাতরের বেড়া, পুশব্যাক, আন্ড়র্জাতিক আইন লংঘন করে ৫৪টি নদীতে বাঁধ নির্মাণ সমস্যা; শ্রীলংকার তামিলদের ভারত কর্তৃক সমর্থন ও সশস্ত্র ট্রেনিং প্রদান; নেপালের সাথে ভারতের ট্রানজিট সংক্রান্ড় বিরোধ; মালদ্বীপে ভারতের হস্ড়ক্ষেপ ইত্যাদি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ অঞ্চলের অধিকাংশ সমস্যাই হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক এবং ভারতের সাথেই সকল প্রতিবেশীর বিবাদ। কিন্তু সার্ক ফোরামে এসব দ্বিপাক্ষিক সমস্যা উত্থাপন করা যাবে না। আঞ্চলিক বিরোধই যদি নিস্পত্তি করা না যায় তাহলে সম্পর্ক উন্নয়নে সার্কের গুরুত্ব কি থাকে? এছাড়া, সার্ক দেশসমূহের মধ্যে নিরাপত্তার ধারণাগত ঐকমত্য ও অভিন্ন পররাষ্ট্র নীতি অনুপস্থিত। এসব কারণে সার্ক একটি সফল আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।

দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ সমস্যাই দ্বিপাক্ষিক এবং ভারতের সাথেই সকল প্রতিবেশীর বিবাদ। কিন্তু সার্কে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা উত্থাপন করা যাবে না। এর ফলে সার্ক সফল আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে একটি উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ধরনের উপ-আঞ্চলিক জোট সার্কের মূল চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে-এই আশঙ্কায় এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হতে পারে নি। তবে, সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের ভিত্তিতে সার্কভুক্ত একাধিক দেশ যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। সার্ক-কাঠামোর মধ্যেই এ সুযোগ রয়েছে। তাই বিগত সার্ক সম্মেলনে পৃথক উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের পরিবর্তে প্রকল্প- ভিত্তিক কার্য-পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সারকথাঃ *দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করে সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সার্ক গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সার্কের প্রস্ড়াবক। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে এ সংস্থাটি ইইসি বা আসিয়ানের মতো কার্যকর হয়ে উঠতে পারে নি। তবে সম্প্রতি 'সাফটা' প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে আন্ত:আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত ইতিবাচক। যদিও দ্বি-পাক্ষিক বিরোধ সিমাংসার সুযোগ সার্কের মধ্যে নেই, তবুও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ফোরাম হিসেবে এ সংস্থার কিছুটা গুরুত্ব অবশ্যই আছে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। কোন্ সালে সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

ক) ১৯৮৪;
খ) ১৯৮৫;
গ) ১৯৮৬;
ঘ) ১৯৮৭।

২। কততম শীর্ষ সম্মেলনে 'সাপটা' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

ক) পঞ্চম;
খ) ষষ্ঠ;
গ) অষ্টম;
ঘ) সপ্তম।

৩। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কোন সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কাছে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্ড়াব পেশ করেন?

ক) ১৯৭৯;
খ) ১৯৮০;
গ) ১৯৮১;
ঘ) ১৯৮২।

৪. কোন কোন সার্কভুক্ত দেশের সাথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বিবাদ রয়েছে?

ক) বাংলাদেশের সঙ্গে;
খ) পাকিস্তানের সঙ্গে;
গ) নেপাল ও ভুটান মালদ্বীপের সঙ্গে;
ঘ) প্রতিবেশী সবগুলো দেশের সঙ্গে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কি কি উদ্দেশ্যে সার্ক গঠন করা হয়েছিল?

২। কোন্ উদ্দেশ্যে 'সাপটা' চুক্তি সম্পাদিত হয়?

৩। 'সাফটা' কি? কখন থেকে কার্যকর হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্কের জন্ম ও এর বিকাশধারা আলোচনা করুন।

২। সার্কের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. গ, ৩. খ, ৪. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১। *Muni and Anuradha, Regional Cooperation in South Asia.*
২। *আতিউর রহমান, সার্ক : রাজনৈতিক অর্থনীতি*

পাঠ - ৫

ও. আই. সি.

Organization of Islamic Conference

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ও.আই. সি. গঠনের উদ্দেশ্য ও এর বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ও.আই.সি.'র কর্ম- প্রক্রিয়া, লক্ষ্য ও নীতিমালার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ও.আই. সি'.র সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- এ সংস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে পারবেন।

ও.আই.সি. গঠনের উদ্দেশ্য

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি এবং অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৃহত্তম কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী ঐক্য সম্মেলনের প্রয়োজন দেখা দেয় বহু আগে থেকেই। বিভিন্ন মতাদর্শের আগ্রাসন মোকাবিলা করে ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের জন্য নিজেদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ফোরামের প্রয়োজনে গঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (Organization of Islamic Conference) । অবশ্য এই প্রক্রিয়া শুরু হয় আরো আগে থেকেই। ১৯৬৪ সালে কিছু মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে মিলিত হন। ১৯৬৯ সালে মসজিদুল আকসায় ইহুদীদের অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা বিক্ষোভ, ঘৃণা এবং নিন্দায় ফেটে পড়লে মুসলিম ঐক্যের বিষয়টি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে ঐ বছর ২৪টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি কার্যকর পদক্ষেপের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালে গঠিত হয় ও.আই.সি (Organization of Islamic Conference)।

ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের জন্য নিজেদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজনে গঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ও.আই.সি।

ও. আই.সি. প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি বিশেষ সম্মেলনসহ মোট ৯টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন আমরা এসব সম্মেলনের সন, তারিখ, স্থান ও দেশের বিস্তারিত তালিকা উপস্থাপন করব।

ও. আই.সি.'র শীর্ষ সম্মেলন সমূহ

সম্মেলন	তারিখ	সাল	স্থান	দেশ
১ম	২২-২৫ শে ফেব্রুয়ারী	১৯৬৯	রাবাত	মরক্কো
২য়	২২- ২৫ শে ফেব্রুয়ারী	১৯৭৪	লাহোর	পাকিস্তান
৩য়	২৫-২৮ শে জানুয়ারী	১৯৮১	মক্কা	সৌদী আরব
৪র্থ	১৫ - ১৮ ই জানুয়ারী	১৯৮৪	ক্যাসাবাংকা	মরক্কো
৫ম	২৬-২৯ শে জানুয়ারী	১৯৮৭	কুয়েত সিটি	কুয়েত
৬ষ্ঠ	৯-১০ ই ডিসেম্বর	১৯৯১	ডাকার	সেনেগাল
৭ম	১৩-১৪ ই ডিসেম্বর	১৯৯৪	রাবাত	মরক্কো
৮ম	৯-১১ ই ডিসেম্বর	১৯৯৭	তেহরান	ইরান

ও.আই.সি.'র কর্ম-প্রক্রিয়া, লক্ষ্য ও নীতিমালা

মুলত: চারটি প্রধান কর্ম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কাজ পরিচালিত হয়-

১) মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন;
২) মুসলিম পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের সম্মেলন;
৩) ইসলামী সেক্রেটারীয়েট এবং তার পার্শ্ব সংগঠন;
৪) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিচারালয়।

একটি পর্যবেক্ষক ও ৫৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা যে সব লক্ষ্যসমূহে কাজ করে থাকে তা হল :

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতির উন্নতি সাধন।
২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কর্মতৎপরতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার সংহতি সাধন এবং আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে পরামর্শ করা।
৩. আন্তর্জাতিক শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সমর্থনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. বর্ণ-বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিলোপ করার প্রচেষ্টা এবং সব ধরনের ঔপনিবেশিকতা উচ্ছেদ করা।
৫. পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানকল্পে বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন ও প্যালেষ্টাইনী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধার ও তাদের মুক্ত করতে সাহায্য প্রদান করা।
৬. স্বাধীনতা, মর্যাদা ও জাতীয় অধিকারের নিরাপত্তা সাধনের লক্ষ্যে সব মুসলিম জাতির সংগ্রামকে জোরদার করা।
৭. সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সব রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সমঝোতা তৈরি করা।

এই সব লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কতগুলো নীতি গ্রহণ করে। গৃহীত নীতিসমূহ হল-

১. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সার্বিক সমতা।
২. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান এবং সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।
৩. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
৪. যে কোন সমস্যা দেখা দিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপোষ রফা অথবা সালিশির মাধ্যমে মীমাংসা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. কোন সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।

ও.আই.সি.'র সাফল্য ও ব্যর্থতা

ও.আই.সি. তার শেষ শীর্ষ সম্মেলনে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার আদায়-এর সংগ্রামকে ও ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদী নীতির নিন্দা করেছে। আফগানিস্ড়ানে গৃহযুদ্ধ অবসান, কাশ্মিরে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন বন্ধ এবং ইরাক ও লিবিয়ার উপর মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহারেরও আহবান জানিয়েছে ও.আই.সি.। এ ছাড়া বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বের সংকটকালে এবং মুসলিম জনতার এই ক্রান্ড়িলগ্নে ও.আই.সি. তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে নি। মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিরসন, ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সোমালিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবেলা; বসনিয়া, কাশ্মীর, মিসর, চেচনিয়া এবং অন্যান্য স্থানে মুসলিম নিধনের মত সমস্যার মোকাবিলায় এই সংস্থা কার্যকর কোন পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। ৫৫টি দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক এই আন্ড়র্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টির পর হতে আজ পর্যন্ড় ২৭ বছর অতিক্রান্ত করতে চলেছে। অথচ এই সংস্থার সফলতা তেমন কিছু হয় নি বললে বেশী বলা হবে না। ইরান-ইরাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধে ও.আই.সি.র তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও আপোষ-মীমাংসার কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সে ব্যর্থ হয়েছিল। অবশেষে জাতিসংঘই তার কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়।

এ সংগঠনের কাছে পৃথিবীর ১২৭ কোটি মুসলমানের প্রত্যাশা ছিল অনেক, কিন্তু তাদের সে প্রত্যাশ্যা পূরণ হয়নি, সংগঠনটি তেমন স্পষ্ট কোন ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

আফগান যুদ্ধের অবসান হলেও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এ ব্যাপারে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারে নি। আজকের আফগান বিরোধে ওআইসির বিফলতা লক্ষ্য করার মত। মুসলিম মুজাহিদ দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা, প্রতিরোধ আন্দালনকে জোরদার করা এবং ইসলামী সরকারকে জোরদার করার ক্ষেত্রে ও.আই.সি.'র অবদান চোখে পড়ার মত নয়। বর্তমানে ইসলামী সরকারের বাস্তবতায় যে বিরোধ আফগানিস্তান দেশটির অস্ড়িত্ব এবং স্বাধীন সত্ত্বাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে তার সমাধানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ভূমিকা নি:সন্দেহে দু:খজনক। আরাকান মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া, কুর্দী মুসলমানদের উদ্বাস্তু জীবনের অবসান, কুয়েত-ইরাক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও.আই.সি.'র সাহসী কোন পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করি নি। যদিও ইসির মত জোট, ইইসির মত অর্থনৈতিক জোট প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টিও কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত হয়নি আজ ২৭ বছরেও। বরং এদের মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবধানই বেড়েছে। যদিও এ সংগঠনের নিকট দুনিয়ার ১২৭ কোটি মুসলমানের প্রত্যাশা ছিল অনেক। অনেকের ধারণা সত্তর দশক জুড়ে আমেরিকা-সোভিয়েত ঠান্ডা যুদ্ধের ফলে ও.আই.সি. তেমন কোন স্পষ্ট ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হলেও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মধ্যে সেরূপ কোন গুণগত পরিবর্তন আসে নি। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্যের এখনও কোন সুরাহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এ কারণেই মুসলমানরা মার খেয়েছে বসনিয়ায় মরেছে কাশ্মীরে, চেচনিয়ায়। ও.আই.সি.'র দুর্বলতার জন্যই ফিলিস্ড়িন রাষ্ট্র আজো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। আত্ববিশ্বাসের অভাব আর অনৈক্যের কারণে বেশ কটি মুসলিম দেশ পাশ্চাত্যের অবরোধের শিকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের বিরূদ্ধে দাঁড়াতে পারে নি ও.আই.সি.। এটাই হচ্ছে ও.আই.সি.'র সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

ও.আই.সি.-তে বাংলাদেশের অবস্থান

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বিভিন্ন পরিকল্পনাভিত্তিক সাংগঠনিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। বাংলাদেশ মূল সংস্থার সদস্য ছাড়াও সংস্থার অন্য সব ক'টি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য। বাংলাদেশ তিন সদস্যবিশিষ্ট আল-কুদস শীর্ষ কমিটি, পনের সদস্যবিশিষ্ট আল-কুদস কমিটি, নয় সদস্যবিশিষ্ট ইরাক-ইরান যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারী শান্তি কমিটি, তের সদস্যবিশিষ্ট তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষ্টাান্ডিং কমিটি, তের সদস্যবিশিষ্ট ইসলামী অর্থ তহবিলের স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালের ৬-১১ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার চতুর্দশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের অবস্থান জোরদার হয়ে উঠে। ফলে পরবর্তী সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশের বক্তব্য অধিক গুরুত্ব পায়।

সারকথাঃ *মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি এবং অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদ থেকেই ১৯৭০ সালে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত ওআইসি'র ৯টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত: চারটি কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এ সংস্থার কাজ পরিচালিত হয়। যথা- ১. মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, ২. মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, ৩. ইসলামী সেক্রেটারিয়েট এবং তার পার্শ্ব সংগঠণ ও ৪. আন্তর্জাতিক ইসলামী বিচারালয়।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। কয়টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ রাবাতে মিলিত হয়ে ও.আই.সি. গঠন করেন ?

ক) ১৮;
খ) ২৪;
গ) ৪২;
ঘ) ১২।

২। কয়টি প্রধান কর্ম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও.আই.সি.'র কাজ পরিচালিত হয়?

ক) চারটি;
খ) পাঁচটি;
গ) সাতটি;
ঘ) নয়টি।

৩। কোন সালে ওআইসি গঠিত হয়?

ক) ১৯৬৪;
খ) ১৯৬৭;
গ) ১৯৭০;
ঘ) ১৯৭৩।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মূল নীতিসমূহ কি?

২। ও.আই.সি.'র বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলন কোন্ কোন্ সালে এবং কোন্ কোন্ দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে?

৩। ও.আই.সি.-তে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ও.আই.সি.'র সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ৩.গ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. *M.Dmer Chapra, Islam and the Economic Challenge, Riyadh : International Islamic Publishing Hoarse, 1992*